IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারায় ‘কালিকামঙ্গল তথা ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য : প্রসঙ্গ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্যে স্বতন্ত্রতা নির্ণয়

মানিক মৈত্র

গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও S.A.C.T-I বাংলা বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় (শিলিগুড়ি), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ABSTRACT

The poem 'Kalikamangal' or 'Vidyasundara' is a popular form of love poetry in medieval Bengali literature based on gods and goddesses. The poem embodies the real essence of contemporary human life and has gained a reputation among many contemporary readers and critics as 'primitive poetry'. However, at that time, as a subject in medieval Bengali literature, besides religion, the love story of men and women also began to be captured in successful narratives. The romantic expression of foreign love in secret love is one of the main recourse of that genre. One of the main examples of that genre is our Kalikamangal or Vidyasundara Kavya, Where human love has become a symbol of sweet juice. Although the poem 'Kalikamangal' or 'Vidyasundara' by Bharat Chandra or Ramprasad is exclusively a product of King Krishnachandra's request, many have also defined it as a timeless creation. Of course, any great creation represents the contemporary. From then on, neither Kalchetana Bharatchandra nor Ramprasad became an obstacle in the case of Rasvas of the poem. It can be said that in their poetry, along with that time consciousness, the real life-thirst of men and women has been purely expressed. The main goal of this article is to explore the eternal romantic love of men and women through the religious veil of the Middle Ages.

Key words : Primitive love-story, Human value, Life-thirst, Eterna love, Love behind religion, Love behind the sexual desire.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলী সাহিত্যের একচ্ছত্র প্রভাবের উৎস ও স্বরূপ জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দম্’ গ্রন্থের ‘মধুরকোমলকান্তপদাবলী’ শব্দটির বিশেষ প্রভাব রয়েছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন। ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর পূর্বসূত্র নির্দেশ হিসেবে জয়দেব উল্লিখিত ‘বিলাসকলাসুকুতূহলাম’ মন্তব্যটিকে অনুমান করা যেতে পারে। উক্ত মন্তব্যটির সঙ্গে বাস্তব লৌকিক প্রেমের গন্ধ মিশ্রিত থাকলেও থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বলা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাপ্ত বিভিন্ন সাহিত্যিক নিদর্শনের পূর্বে বাংলাদেশে রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর যে সামান্য পরিচয় আমরা পাই লৌকিক বাস্তব প্রেমের

বিচারে তা নগণ্য। তবে বিষয়টি নগণ্য হলেও একেবারে উপেক্ষিত ছিল না হয়তো। তাই চর্যাগীতির দু-একটি পদেও আমরা এরকম বাস্তব প্রেমের ছোঁয়া পাই। চর্যার কাহ্নপাদ বলেছেন ---

"কইসণি হালো ডোম্বী তোহেরি ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝে কাবালী।।ধ্রু।।
তঁই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।।ধ্রু।।"[১]

কাহ্নপাদের এই পদটিতে সেকালের বাস্তব লৌকিক প্রেমের গন্ধ মিশ্রিত রয়েছে বোঝা যায়। এছাড়াও চর্যার অন্যান্য অনেক পদে (যেমন, ২, ৬, ২৮ ও ৪০ নং চর্যা) লোকায়ত জীবনের বাস্তবতার ফাঁকে ফাঁকে প্রেম ও ভালোবাসা বিষয়ক রোমান্টিকতার জ্যোৎস্না যে পড়েছে তা অনস্বীকার্য। উক্ত চর্যাগুলিতে প্রেমলীলার রূপক গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, পদগুলির ধর্মীয় রূপক যাই হোক না কেন, সেগুলির মধ্য দিয়ে সমকালীন বাস্তব প্রেমের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে - তা স্বীকার করতেই হয়। এছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর যে আখ্যানভাগ রয়েছে তাতে ধর্মীয় আবরণ ছেড়ে দিলে তাকে লৌকিক মানব-মানবীর প্রেমের কাব্যই বলা চলে। বাংলা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর'-এর রোমান্টিক আখ্যানভাগটির পূর্বে এভাবেই বিভিন্ন সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়ের ইঙ্গিতটি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, যা পরবর্তীকালে যুগ-মানসের চাহিদায় দক্ষ কবিদের হাতে পড়ে পরিপূর্ণ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রূপে উঠে এলো। তারই উদাহরণ – 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর', 'পদ্মাবতী', 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী', 'মধু-মালতীর' কাহিনী।

তুর্কি বিজয়ের ফলে ইসলাম ধর্মের প্রচার যেমন প্রবল আকার ধারণ করে তেমনি ইসলাম ধর্মের সুফি সাধকদের ঐশীচেতনাও ডানা মেলতে শুরু করে। যাদের সঙ্গে ভারতীয় বাউল সম্প্রদায়ের মতাদর্শগত মিল রয়েছে। এরা দেবতার সঙ্গে মানুষের একাত্মতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সর্বোপরি বলা যায়, মানুষের জীবনকে তারা সেই সময়কালে দাঁড়িয়েও সমান অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তুর্কি বিজয়ের ফলে আগত এই সুফি সাধকদের পাশাপাশি নবাগত মুসলিম কবিগণও দেশীয় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লৌকিক প্রেমকাব্য রচনায় আকৃষ্ট হন। এছাড়াও সমকালীন মুসলমান শাসক ও বণিক উভয় শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাদের মনোরঞ্জন করার জন্য সমকালীন কবিরা নর-নারীর প্রেম বিষয়ক কাব্য রচনায় উৎসাহী হন। তৎকালীন ধর্মীয় ঘেরাটোপকে স্মরণে রেখে তারা কখনো নর-নারীর সেই প্রেম কাহিনীর সঙ্গে ধর্মীয় মোড়কও জুড়ে দিয়েছেন। এভাবেই পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দী থেকে বেশ কিছু কবির হাত ধরে রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের একটি ধারা মধ্যযুগের সাহিত্যে যুক্ত হয়ে যায়। যদিও আমরা জানি রোমান্টিকতা শব্দটি উনিশ শতকের শিল্প ভাবনার ফসল। এই উনিশ শতকীয় রোমান্টিকতা শুধুমাত্র কল্পনা সর্বস্ব বিষয় বস্তুকেই বোঝায় না ; সেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সূত্রে সেই রোমান্টিকতা গ্রথিত ও ব্যঞ্জিত। সৃজন মূলক কল্পনাশক্তি এই রোমান্টিকতার অন্যতম বাহন। মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলিতে এই সৃজনমূলক কল্পনাশক্তি লক্ষ্য করা যায় না (ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-এর যথার্থ প্রকাশ না থাকায়)। সেখানে সমস্ত সৃজনী শক্তির কৃতিত্বই দেবতার স্বপ্নে পর্যবসিত হয়েছে।

'রোমান্টিক' বা 'রোমান্টিকতা' শব্দটির একটু গোরাতে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে আমরা দেখব এর সঙ্গে 'রোমান্স' শব্দটির ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে শব্দ দু'টির মূল স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যেতে পারে। কেননা, রোমান্স ও রোমান্টিকতা সমধর্মী শিল্প চেতনা নয়। আমরা পূর্বেই বলেছি রোমান্টিকতা উনিশ শতকের ফসল। আরও বলা যায়, 'কর্তৃত্ব, ঐতিহ্য এবং ধ্রুপদি শৃঙ্খলার প্রতি যে ঝোড়ো বিদ্রোহ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাকেই সাহিত্যের ইতিহাসে 'রোমান্টিকতা' নামে অভিহিত করা হয়।[২] খুব সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, রোমান্টিকতা হল সেই মনোভাব, যা ব্যক্তির বিবেচনাবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, অর্থাৎ যা ভাবকেন্দ্রিক, কাল্পনিক ভাবাবেগ প্রসূত। এই রোমান্টিক কাহিনী কাব্যের প্রধান আকর্ষণ তার কাহিনী। বাংলা রোমান্টিক আখ্যানের এই কাহিনীগুলি প্রায় সবই এসেছে মুখে বলা গল্প থেকে। একাদশ দ্বাদশ শতক এর সূচনাকাল বলা যায়। অন্যদিকে 'রোমান্স' হল আঞ্চলিক ভাষায় (ভাষা তাত্ত্বিকদের মতে রোমসহ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের সাতটি আধুনিক ভাষা, যাকে বলা যায় 'রোমান্সভাষা') রচিত একধরনের উপকথা, গাথা ও রোমাঞ্চকর কাহিনী। এই কাহিনীগুলি 'রোম্যান্স' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যদিও বলে রাখা প্রয়োজন 'রোমান্সভাষা' থেকে 'রোমান্সসাহিত্য' হয়ে ওঠার এই পরিবর্তনের ধারাটি আজও অনেকের অনুসন্ধানের

বিষয়। এই ধরনের সাহিত্যকর্মের মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল অলৌকিক, বীরত্ব, শৌর্য ও আনুগত্যের নিদর্শন, রহস্যপ্রিয়তা এবং অপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি আগ্রহ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তীকালে যে সাহিত্যে পরিলক্ষিত হল তা 'রোমান্স-সাহিত্য' নামে চিহ্নিত হতে লাগলো। বলা যায়, সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ এই রোমান্সসাহিত্য। আরও দেখা যায় কোন কোন সমালোচক 'রোমান্স-কাব্য'-কেই 'রোমান্টিক' নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে ইংরেজ সমালোচকরাও এর ব্যতিক্রমী নন। এই রোমান্স থেকে রোমান্টিকতায় উত্তরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমালোচক আব্দুস সাত্তার বলেছেন – "অষ্টাদশ শতকের প্রথম এবং মধ্যভাগে অভিজাত শ্রেণি একদিকে যেমন রোমান্স-সাহিত্যের প্রতি অপ্রিয় মনোভাব পোষণ করে অনুরাগ ব্যক্ত করতেন ধ্রুপদি ধ্যান-ধারণা ও তার সহনশীল সূক্ষ্মতা এবং সুরুচির প্রতি, অপরদিকে অনুরূপভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পুনরাবিষ্কার করে মধ্যযুগীয় গাথা সাহিত্যকে। এই রোমান্স-সাহিত্যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় ব্যক্তিগত বীরত্বের আকাঙ্ক্ষা, জাতীয়তাবাদী আবেগ ও ধর্মীয় রহস্যময় দিকগুলির প্রতি। এই আকর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট করেছে রোমান্স-সাহিত্যকে। আর এইভাবেই উত্তরণ ঘটে রোমান্স থেকে রোমান্টিকতার।"[৩] এই রোমান্টিকতা ঠিক বাস্তব বিরোধী নয়। বাস্তব জীবনে এমন অনেক বস্তু, ঘটনা, বিষয় আছে যা বাইরের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি মানুষের অন্তর জীবনেও কতগুলি অনুভূতির লীলা রয়েছে যার নির্দিষ্ট কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, যা একান্তভাবে ব্যক্তিমনের গোপন রহস্য সেই বাস্তব কল্পজগৎ ও জীবন রোমান্টিকতার মূল উপজীব্য বিষয়। স্বপ্ন, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায়। স্বপ্নের বিষয় ও ফল অলীক হতে পারে, কিন্তু স্বপ্ন দর্শন মিথ্যা নয়। মানুষ মাত্রেরই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আছে। অতএব তার অস্তিত্ব সত্য, বাস্তব। এ স্বপ্নকে জীবনানুকূল করে শিল্পরূপ দিতে পারলে রোমান্টিকতার সৃষ্টি হয়। স্বপ্নকে জীবনধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিল্পী যদি কল্পনার জাল বুনে চলেন তবে তা লঘু পক্ষতরল রোমান্সের বিষয়ে পরিণত হয়। বলা যেতে পারে এভাবেই মধ্যযুগে রোমান্টিক আখ্যানগুলি রোমান্সের হাত ধরে ডানা মেলতে থাকে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা ছিল মূলত দেববাদ নির্ভর। এই দেববাদ নির্ভর সাহিত্যের একপক্ষে দেবতা তথা ধর্ম মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও অপরপক্ষে সেই দেবতার পূজা তথা ধর্মকে পালন করার জন্য মানবের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে যেমন দেবখন্ড রয়েছে তেমনি নরখন্ড (বণিকখন্ড) রয়েছে। আবার কোথাও দেবতা স্বয়ং শাপগ্রস্থ হয়ে মানবের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সূত্রেই মধ্যযুগের সাহিত্যে মানবের কাহিনী সামান্য হলেও স্থান করে নিয়েছে। এছাড়াও পৌরাণিক, ঐতিহাসিক লৌকিক রাজাদের বিচিত্র কাহিনী রয়েছে, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শুধুই মানুষ। এই মানুষের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের, কাহিনী নিয়ে মধ্যযুগে একশ্রেণীর সাহিত্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। যেগুলির মূল বিষয়বস্তু ছিল লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানের মিশ্রণে মানব-প্রেমের কথা, মানব-জীবনের কথা উপস্থাপন করা। এই কাহিনীগুলিতে ধর্ম তথা দেবতা মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। দেবতা কখনো কাব্যের মোড়ক হিসেবে থাকলেও তা নিতান্ত গৌণ একটি আবরণ হয়েই রয়ে গেছে। মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, তার বিনিময়ে কঠোর ত্যাগ স্বীকার করা ইত্যাদি সেই কাব্যগুলির মূল আকর্ষণ। মধ্যযুগের এরকম কিছু সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – 'পদ্মাবতী' কাহিনী, 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী' কাহিনী, 'মধু-মালতী' কাহিনী, 'চন্দ্রাবতী' কাহিনী, ময়মনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র বিভিন্ন গীতিকাগুলি এবং 'কালিকামঙ্গল' নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর'-এর প্রেমকাহিনী। যে কাব্যগুলিতে দেবতা নয়, ধর্ম নয়, মানুষ ও তার হৃদয়ের প্রেম-ভালোবাসাই মুখ্য রূপে উঠে এসেছে। কবিগণ এসব কাব্যে মানব প্রেমের জয়গান করেছেন। মানব-মানবীর হৃদয়ের সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাতে মানব প্রেমের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যে মানব প্রেমের জয় ঘোষণা করতে গিয়ে কবিগণ নর-নারীর দেহগত প্রেমের কথাই বেশি বলেছেন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই সংযোগ থাকার ফলেই প্রণয়কাব্যগুলোর আবেদন এত হৃদয়গ্রাহী। এই ধারার অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই ছিল প্রেম ও সৌন্দর্য সৃষ্টি। এগুলোতে মানবের হৃদয়বৃত্তি, চিত্তবিলাস ও সম্ভোগের যে লীলা প্রকাশিত হয়েছে তাতে সেযুগের শিল্প কর্মের ধারায় নতুনরস ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছে। ইতিপূর্বে হিন্দু কবিদের আখ্যানমূলক কাব্যে লৌকিক জীবনের ছায়াপথ থাকলেও তাতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজারতী প্রাধান্য পেয়েছে। অধিকাংশ মানব চরিত্র, দেব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। চাঁদ সওদাগরের মতো ব্যক্তিত্বও দেবতার প্রভাব এড়াতে পারেনি। প্রণয়োপখ্যানের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক, রাজার বিচিত্র কাহিনী যেগুলির প্রধান আবেদন হলো মানব প্রেম।

মধ্যযুগের মানুষের চিন্তাধারা অন্ধবিশ্বাস ও কল্পনার দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবিত ছিল। তাই মধ্যযুগের লঘু-গুরু, বাস্তব-অবাস্তব, মানবিক-দানবিক ইত্যাদি নানা মিশ্রভাবের রচনাগুলিকে কেউ 'রোমান্টিক প্রেমকাব্য' আবার কেউ 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' বলতে চেয়েছেন। আমাদের আলোচ্য 'কালিকামঙ্গল' কাব্যও বাস্তব-অবাস্তব মেশানো এরকমই একটি রোমান্টিক

প্রণয়োপাখ্যান। এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলির রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ওয়াকিল আহমদ মহাশয় তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন --- "একনায়কতান্ত্রিক শাসনকাঠামো এবং ভূমিভিত্তিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পাল-সেন যুগের মত পাঠান-মুঘল আমলে অব্যাহত থাকে। এরই অপর নাম সামন্তবাদ। সামন্তপতি ধন-জন সব কিছুর মালিক। এজন্য তিনি ভূপতি এবং নৃপতিও। একই অর্থে ভূপাল ও নরপাল শব্দের ব্যবহার। তিনিই রাজ্যের দণ্ড মুণ্ডের মালিক। অর্থাৎ রাজার ইচ্ছার উপর প্রজার রুজি-রোজগার, মান-সম্মান, জীবন মরণ নির্ভর করে। এই সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাতে সমাজই মুখ্য, মানুষগৌণ। মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করে শর্তহীনভাবে। রাজা ও রাজার অনুগৃহীত শাসক শ্রেণীর সুখ ও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রাজ্যের কৃষক, শ্রমিক, কারিগর, শিল্পী, ধার্মিকজ্ঞানী, গুণীর সমস্ত কাজ ও ধ্যান-ধারণা নিয়োজি হয়।... অর্থাৎ রাজা রাষ্ট্র ও সমাজের মত ধর্ম ও সংস্কৃতিরও অধিপতি।... সামন্ত রাজার কাছে নারী ছিল পণ্যতুল্য; এজন্য তাঁর নারী-প্রেম ছিল না, নারী সম্ভোগ ছিল। নারী-রত্ন পাওয়ার ও ভোগের জন্য জীবনকে বাজি রেখে তিনি যুদ্ধ করেন, নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। এ হল প্রধান সামন্ত থেকে শুরু করে জায়গীরদার, জমিদার, মহারাজা পর্যন্ত পাতি-সামন্তের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রোমান্সের কবিগণ অনেকে শ্রেণীর সামন্ত প্রভুর রাজসভায় অবস্থান করেন, পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন ধারণ করেন এবং তাঁদের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তাঁদেরই মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কাব্য রচনা করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে সে রচনায় তাঁদের সমশ্রেণীর জীবনকাহিনী প্রতিবিম্বিত হয়। তাঁদের অভিপ্রায় ও অভিরুচি অনুসারেই সে জীবন বাস্তবধর্মী ও ভোগমুখী হয়েছে। কোন কোন কাব্যে ধর্ম কথা থাকলেও তা আছে অপরোক্ষভাবে রূপককে আশ্রয় করে।"[৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র সম্পর্কে একথা অনেক বেশি সত্য। কেননা ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং তার মনোরঞ্জনকে সামনে রেখেই 'বিদ্যাসুন্দর'-এর কাহিনী 'অন্নদামঙ্গলে' সন্নিবেশিত করেছিলেন।

একসময় চণ্ডীর গান, শিবের গান, দুর্গার গান, মনসার গান সাধারণ মানুষের অবসর বিনোদনের সঙ্গী ছিল। দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন শুনেই তারা তৃপ্তি লাভ করত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগমানসে এবং ব্যক্তিমানসে পরিবর্তন ঘটতে লাগল। মানুষ দেবতার পাশাপাশি নিজের হৃদয়ের সুপ্ত বাসনাগুলোকেও গোপনে প্রাধান্য দিতে চাইল। এছাড়াও বিদেশি নবাগত বণিকগনের আগমনে প্রচলিত দীর্ঘকালের রীতি-নীতি, সংস্কারে নতুনের ছোঁয়া অনুভূত হতে লাগলো। এই নবাগত বণিকেরা বিনোদনের জন্য দেবতা ও ধর্ম বিবর্জিত সময়কেই অবলম্বন করল। অন্যদিকে পাঠান, মুঘল আমলের দরবারী জৌলুসতো ছিলই। এই সুযোগে লৌকিক রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলি সমকালীন কবিদের হাতে এক অন্য মাত্রা পেতে লাগলো। যে প্রণয়কাহিনী রাজা ও নবাবদের দরবারের অশুচি অন্তরঙ্গতার বেষ্ঠনে আবদ্ধ ছিল, তাই যুগের চাহিদায় সর্বসাধারণের চাহিদার বিষয় হয়ে উঠলো। সেই সময়কালে লৌকিক ধর্ম-সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ধর্ম-নিরপেক্ষ লৌকিক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচিত হতে লাগলো। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয় --- "যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভাব ও ধর্মবিশ্বাসের ক্রম অবনতি। সমাজ জীবনের ক্রমপরিণতির ধারাতেও এ লক্ষণ সুস্পষ্ট। বিস্ময় ও একান্ত দৈব নির্ভরতার ধোঁয়াটে ভাব কমিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি প্রবণ মনের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর চন্ডীমঙ্গলের শিব-দুর্গা ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিব-দুর্গার পার্থক্যই ইহার প্রমাণ। ভক্তি ক্রমে ব্যঙ্গের স্তরে নামিয়াছে। দৈববিশ্বাস একান্ত অবিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।"[৫] যদিও কখনো বা যুগগত ধ্যান-ধারণাকে স্মরণে রেখে সেই লৌকিক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলির সঙ্গে ধর্মের এক সূক্ষ্ম আবরণও জুড়ে দেওয়া হতে লাগলো। আমরা দেখব 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে এই বাহ্যিক ধর্মীয় আবরণ সরিয়ে দিলে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে কাব্যটি কতটা সার্থকতা লাভ করেছে।

মধ্যযুগের কাব্যধারায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল। তার কারণ মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অবিকশিত ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুপস্থিতির কারণে মৌলিক বিষয়ের সন্ধান না পাওয়া। এর মাঝে কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপথ লক্ষ্য করা গেলেও দেব-দেবীর অতি প্রাধান্যে মানবিক অনুভূতির প্রকাশ ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই মধ্যযুগের গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় লৌকিক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি নর-নারীর প্রেমকে উপস্থাপিত করে এক ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য এই ধারাটিতে হিন্দু কবিগণ অপেক্ষা মুসলমান কবিগণের আধিপত্য অধিক। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, হিন্দু কবিগন নিজের ধর্মাচারে অনেক বেশি আবদ্ধ থাকায় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিতেও তারা ধর্মীয় আবরণ জুড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আদিতে 'কালিকামঙ্গল'-এর মূল আখ্যানে হয়তো শুধু মাত্র বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়

কাহিনী ছিল। কিন্তু ধর্মভীরু কবিদের হাতে পড়ে আখ্যানটিতে কালিকার আবরণ যুক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে মুসলমান কবিগন এই ধারায় অনেক বেশি অভিনবত্ব দেখান। তারা ধর্মাচারকে উপেক্ষা করে মানবিক রসকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলির মূল উৎস নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। কোন কোন সমালোচকদের মতে 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীর আদি উৎস কাশ্মীরি কবি বিলহন রচিত সংস্কৃত 'চৌরপঞ্চাশৎ' বা 'চৌরপঞ্চাশিকা' ও বররুচির 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্' । কেননা ইতিপূর্বে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের প্রণয়মূলক খাঁটি রোমান্টিক আখ্যায়িকার সন্ধান পেয়েছি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - বররুচির 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানম্', দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এবং বাণভট্টের 'কাদম্বরী' গদ্যকাব্য। এছাড়াও কালিদাসের 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশীয়', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্', শ্রীহর্টের 'প্রিয়দর্শিকা', 'নাগানন্দ' প্রভৃতি কাব্য-নাটকগুলিতেও রোমান্টিকতার পরিচয় বিদ্যমান। যেহেতু সংস্কৃত সাহিত্য ধারায় এই ধরনের রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাহিনী পূর্ব থেকেই প্রচলন ছিল, তাই অনেকে 'কালিকামঙ্গল' নামে প্রচলিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারাটির মূল উৎস হিসেবে সংস্কৃত এই উৎসকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেকে মনে করে দেশীয় লৌকিক ঐতিহ্য বিদ্যাসুন্দরের মূল আখ্যানভাগটি পূর্ব থেকেই প্রোথিত ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মনসুর উদ্দিন সাহেবের 'দর্জির শাস্তর' লৌকিক আখ্যানভাগটির সঙ্গে 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কাব্যধারাটির উৎস যাই হোক না কেন, আমরা দেখব ধর্মীয় মোড়ক বহির্ভূত আখ্যানভাগটি বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে পাঠক হৃদয়ে কতটা আসন করে নিয়েছে।

'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর'-এর মূল আখ্যানভাগটি সংক্ষেপে এরকম - সুন্দর নামে এক রাজপুত্র গভীর রাত্রিতে 'ভদ্রকালী'র আরাধনায় দেবীকে সন্তুষ্ট করে বর লাভ করলেন যে তিনি রাজকন্যা বিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ করবেন। অতঃপর দেবী-প্রদত্ত এক শুক পক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যার পিতৃ রাজ্যে উপনীত হলেন। তথায় বৃদ্ধা মালিনীকে 'মাসী' বলে ডেকে তাঁর গৃহেই আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এরপর মালিনীর সহায়তায় সুন্দর বিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, সরোবর স্নানকালে তাদের সঙ্কেতে ভাব বিনিময়ও হলো। অতঃপর কালিকার বরে সুন্দরের গৃহ থেকে বিদ্যার মন্দির পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গ পথ নির্মিত হলে সুন্দর প্রতি রজনীতে বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন। এরই মধ্যে তারা গন্ধর্ব মতে পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ হয়েছিলেন। এর ফলে বিদ্যার গর্ভ-লক্ষণ দেখা দিলে রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে নগরপালকে চোর ধরতে আদেশ করলেন। নগরপাল কিছুতেই চোর ধরতে না পেরে অবশেষে বিদ্যার মন্দির সিন্দূর দ্বারা লিপ্ত করে দিল। ফলে সুন্দরের পরিচ্ছদে সিন্দূর চিহ্ন লাগল। রজক গৃহ থেকে সিন্দূর চিহ্নিত কাপড়ের সূত্র ধরে নগরপাল সুন্দরকে অপরাধী সাব্যস্ত করল। বিচারে সুন্দরের শূল দণ্ডের আদেশ হল। শ্মশানে সুন্দর 'কালিকা'র আরাধনা করলে দেবী আবির্ভূতা হয়ে রাজাকে সুন্দরের পরিচয় দান করে তাকে মুক্তি দিতে আদেশ করল। অতঃপর রাজার সম্মতিতে সুন্দর বিদ্যাকে বিবাহ করে স্বদেশে নিয়ে গেলেন। এই মূল অংশটি নিয়ে একাধিক কবি মধ্যযুগে কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্যাসুন্দরের মতো এই প্রাচীন রোমান্টিক কাহিনিটিতে বন্ধনহীন দুঃসাহসী প্রেমের চিত্র আছে, তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এই প্রেম কোনো নীতি-নিয়ম বা বন্ধন শাসনকে মানতে চায়না বা তার জন্য কালিকার দোহাই দিতে হয় না। কিন্তু বাংলায় কালিকামঙ্গলের মধ্যেই এই পালাটি জুড়ে দিয়েছেন তৎকালীন কবিরা। তাই কাব্যে কালিকা একটি বাহ্যিক ধর্মীয় মোড়ক হিসেবেই এসেছে বলে মনে হয়।

'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর'-এর উপরিউক্ত আখ্যানভাগ অবলম্বনে কাব্য রচয়িতারা হলেন কঙ্ক, শ্রীধর, সাবিরিদখাঁ, নিমতার কৃষ্ণদাস ও 'কবিবল্লভ' প্রাণরাম চক্রবর্তী। এছাড়া নেপালে প্রাপ্ত কাশীনাথের 'বিদ্যাবিলাপ' নাটক, বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর ও গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গলে'র কথাও এইধারায় উল্লেখ্য। বিদ্যাসুন্দরের কবিদের মধ্যে এরপরে অষ্টাদশ শতকে আসেন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেন। এদের হাত ধরেই জয়-জয়কার হয় 'বিদ্যাসুন্দর' তথা 'কালিকামঙ্গল' কাহিনির। কাব্যধারাটি সমাদর লাভ করে দরবারি রুচিতে, নাগর-মনে।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের তিন খণ্ডে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের দ্বিতীয় খন্ডের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল' । এই কাব্যধারায় তিনিই প্রথম এবং একমাত্র কবি নন। তাই বলা যায় ভারতচন্দ্র পুরনো ধারার অনুবর্তন স্বরূপই তার কাব্যটি রচনা করেছেন। তাসত্ত্বেও বলতে হবে তিনি কেবল আক্ষরিক অর্থে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচনা করেননি। কাব্যের ভক্তি রসের মধ্যে গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিয়ে ছিলেন প্রবল আদিরস (বিদ্যাসুন্দর অংশ যার প্রমাণ)। যার মূল ভিত্তি ছিল নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই কাব্যটির প্রশংসায় 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' রচয়িতা মন্তব্য করেছেন—"অন্নদা মঙ্গলকাব্যের

অন্তর্ভুক্ত করিয়াই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"[৬] তাই বলা যায় অষ্টাদশ শতকের সামগ্রিক ঐতিহ্য ভারতচন্দ্রের কাব্যে সম্পূর্ণ রূপে উপস্থিত। সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম তার 'বিদ্যাসুন্দর', যা তাকে নিন্দিত ও নন্দিত করেছিল।

রোমান্টিক সাহিত্যের এক দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য প্রেম। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি ভারতীয়-সাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকেই হিন্দি-অবধি, সংস্কৃত-প্রাকৃত, আরবি-ফারসি রোমান্টিক সাহিত্যকে এই প্রেমের ধারা যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট করেছিল। 'বিদ্যাসুন্দর' তথা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যটিও তারই এক অতুজ্জ্বল নিদর্শন। এই প্রণয়-গাথা অষ্টাদশ শতকের রাজ-রুচিতে নাগরিক মানসে অত্যন্ত প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছিল। তাই সমালোচক প্রমথ চৌধুরী এই কাব্যের মূল্যায়নে লিখেছেন — "বিদ্যাসুন্দর খেলনা হলেও রাজার বিলাস ভবনের পাঞ্চালিকা সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণি মুক্তায় অলঙ্কৃত।"[৭] প্রাচীন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও দুঃসাহসী ও বন্ধনহীন প্রেমের চিত্র আমরা দেখতে পাই। যে প্রেম কোন নীতি ও বন্ধনের শাসনকে স্বীকার করেনা। এই ভাবকল্পনার মধ্যেই রোমান্সের বিষয় বিদ্যমান। যা কাব্যটিকে রোমান্টিকতায় পর্যবসিত করেছে। ভারতচন্দ্র এইভাব বস্তুকে তার কাব্যে উপস্থাপন করেছেন 'বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ' অংশে এভাবে ---

"নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজভয়ে আর কি করে।।
সময় পাইল মদনে মাতিল
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গর গর অধরে অধর
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে।।
সখীগণ সঙ্গে গায় নানা রঙ্গে
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস হাস পরিহাস
ভারত উল্লাস অন্তরে।।"[৮]

এভাবেই হাস্য-পরিহাস, রঙ্গ রসিকতায় ভারতচন্দ্র কাব্যটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিদ্যার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়ে দিবসে সুন্দর যখন বেকার, তখন নব সাজের লীলা রঙ্গ উপভোগ করতে সন্ন্যাসী বেশে সে হাজির হলো রাজসভায়। ভারতচন্দ্র লিখেছেন —

"কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায়।।
... ...
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব।।
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে।।
করে করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা।। "[৯]

এভাবেই নর-নারীর লাস্য লীলাকে ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। এইসব পঙক্তিগুলি নাগর-নগরীর রস ভাষ্যে লীলায়িত। এই লীলাময় রস ভাষ্যের স্বরূপ উন্মোচনে ভারতচন্দ্রের বাক্-বৈদগ্ধ্য এক অন্য মাত্রায় পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে।

'কালিকামঙ্গল' বা ' বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানে বিদ্যা ও সুন্দরের সমগ্র প্রণয়োপাখ্যানটি এক আশ্চর্য দক্ষতায় অঙ্কিত। সম্ভোগরসময় এই প্রেমলীলায় বিদ্যা ও সুন্দর বাস্তব রক্ত মাংসের মানব-মানবী রূপেই যৌবনাকর্ষণে নিমজ্জিত। স্বাভাবিকভাবেই এখানে কোনো তত্ত্বের আবরণ ও আড়াল মাত্র নেই। কাব্যে যেটুকু ধর্মীয় আবরণ রয়েছে তা সমকালের যুগগত বৈশিষ্ট্যকে সম্মান জানানো মাত্র। এ ইধর্মীয় আবরণ উন্মুক্ত করলে ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে বুদ্ধির প্রাচুর্য, ঐহিকতাবাদ ও প্রণয়-রচনায় বাস্তবতাবাদ - তার সবটাকেই আধুনিকযুগের উপাদান বলে ধরা যায়। তার কাব্যের নির্মিত চরিত্রগুলি যেন দেবতার প্রতিনিধিত্ব করেনি। তারা

রক্ত মাংসে গড়া মানুষের মতোই পাঠক সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তাই বিদ্যা সুন্দরকে দর্শন করা মাত্রই মানবিক সুরে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। সেখানে কোন দৈব অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় না। 'বিদ্যাসুন্দরের দর্শন' অংশে বিদ্যা বলেছেন ---

"কি বলিলি মালিনি ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল।।
… .. … .. . . . . … … .. . … . . . . . .
বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে।।
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি।।
যতগুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা।।"[১০]

ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত বিদ্যা বৈরাগিনী নন। বিবাহের প্রয়োজন তার কাছে মানসিক এবং শারীরিক দু-দিক থেকেই সত্য। আলোচ্য কাব্যে বিদ্যার বিচারের (স্বয়ংবর সভার নামান্তর) অন্তরালে আসলে বিদ্যা আশ্রয় নিয়েছিল নিজের চরিত্র রক্ষার জন্য রাজপুত্র নামক 'রাজ বংশে চাষার' হাতে সে পড়তে চায়নি বলে। অবিদ্যার দাস কখনো বিদ্যার প্রভু হতে পারে? কিন্তু যতই তার সূক্ষ্ম ও উচ্চ বুদ্ধির কাছে চাষা-জাতীয় রাজপুত্রেরা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেছে, ততই তার যৌবন ভিতরে ভিতরে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। কাব্যে আমরা দেখি ---

"ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া।।"[১১]

সুন্দরের কলাকৌশল দেখে, কবিতা পড়ে, রূপের বর্ণনা শুনে, সে বুঝল এতদিনে সত্যই নিধি এসেছে। আহা বিধাতার দান, 'বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই। এখন পরাজয়ের চেয়ে বড় জয় আর নেই, বিদ্যা জানে কখন হেরে জিততে হয় 'হারাইলে হারিব, হারিলে যে জিনি'। লজ্জা না রেখেই নিজেকে খুলে ধরল।

"এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূ।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল।।"[১২]

বিদ্যার এমন বিপর্যস্ত অবস্থা যে, মৌলিকতাকে পর্যন্ত সে উৎসর্গ করে বসল সুন্দরের প্রতিভার কাছে। কাব্যে এই বিদ্যার রূপ বর্ণনায় ভারতচন্দ্র দেহকে অনেক বেশি উন্মুক্ত করে তুলে ধরলেও তাতে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা নেই। রয়েছে দেহের প্রতিটি অঙ্গকে খুঁটিয়ে দেখে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা। 'বিদ্যার রূপ বর্ণনা' অংশে আমরা দেখি ---

"বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।।
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কত গুলা।।…
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।।…
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধর।
শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে।।…
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়।।
মেদিনী হই মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া ওঠে থাকিয়া থাকিয়া।।"[১৩]

বিদ্যার এই দেহরূপের বর্ণনা দেখে সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় জানিয়েছেন – 'বিদ্যার দেহ নিভৃত রহস্যের নৈশ প্রতিমা নয়, প্রকাশ্য প্রদর্শনীর দুর্লভ সংগ্রহ।'[১৪] এই বিদ্যা নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে নিজে পছন্দ করেই বেছে নিয়েছেন এবং তাকে কাছে পেতে উতলা হয়েছেন। অংশগুলি পাঠ করলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কাব্যটিতে মানবিক প্রেমানুভূতি উপস্থাপন করাই ভারতচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়াও কাব্যের 'পুরবর্ণন' অংশে ভারতচন্দ্র প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে আমাদের জানিয়ে রেখেছেন ---

"ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।।
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভারত যেমত চাহে সেইমত চাও হে।।"[১৫]

অংশটি পাঠে পাঠক অনুমান করতে পারেন ভারতচন্দ্র তার কাব্যে নতুন দৃষ্টিকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। ভারতচন্দ্র যেভাবে ভেবেছেন সেভাবে ভাবাতে চেয়েছেন, যেভাবে দেখেছেন সেভাবে দেখাতে চেয়েছেন। আর ভারতচন্দ্র সমকালীন যুগ ও জীবনকে কিভাবে দেখেছেন, ভেবেছেন এবং এঁকেছেন তা, তার কাব্যের বিষয়চয়ন (ইতিপূর্বে অন্নদাকে নিয়ে কোন কাব্য রচনা হয়নি, তার পূর্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হলেও জনমানসে ততটা খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি), বিষয়কে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন, আরবি-ফারসি মিশ্রিত সংস্কৃত শব্দের সার্থক প্রয়োগ, ছন্দ অলংকারের প্রয়োগ, সর্বোপরি কাব্যের খ্যাতি সূত্রেই অনুমান করা যেতে পারে। ভারতচন্দ্র আধুনিকতার প্রতিনিধি নন। কেননা, তাঁর রচনায় নূতনের অস্ফুট পদধ্বনি শোনা গেলেও, তা দূরায়ত। তাই তার মন ও মনন আবেগ প্রাবল্যকে স্বীকার করেনি, বরং বুদ্ধির খরতাই প্রবল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর কাব্যে। ধর্মও তাঁর কাছে অলঙ্ঘনীয় বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়নি। তাই দেব-দেবীরাও তাঁর কাব্যে সাধারণ মানব-মানবীর মতোই হাসির উপাদান নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এইখানেই পরিস্ফুট হয় তাঁর কাব্যের ও চেতনার মৌলিক দিকটি। তাঁর এই চিন্তা-চেতনাতেই অজেয় তাঁর কাব্যের বাণীরূপ। তাই সমালোচক প্রমথনাথ বিশী 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন --- "অন্নদামঙ্গলকে রোমান্টিক কাব্য-হিসাবে পাঠ করিলেই যথার্থভাবে পাঠ করা হইবে। ইহা তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমখণ্ডকে দেবখণ্ড বলিতে পারি। ইহাতে ভারতচন্দ্রের রোমান্টিক কবিপ্রতিভা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।... দ্বিতীয়খণ্ড বিদ্যাসুন্দর। এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর রোমান্টিক কাব্য বাংলা ভাষায় আর নাই। অশ্লীলতাই নাকি ইহার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী একই মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত। দুয়েরই ভাব-উপজীব্য অসামাজিক গুপ্ত প্রেম। কেবল প্রভেদ এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপক, আর বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপবান। রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকে অতিক্রম করিয়া অরূপে পৌঁছিয়াছে, বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাধাতো আরাধিকা; তাহার প্রেমে বিশেষ নির্বিশেষ হইয়াছে, আর বিদ্যার প্রেম হৃদয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বাসনাকে একজনের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর কবি, আর্টিস্ট; তাহার প্রেম রূপে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ দুই প্রেমই সমাজ শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। এই হিসাবে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের ভাব জীবনের বংশধর। কৃষ্ণবাঁশির সুরে রাধার হৃদয়ে রন্ধ্র নির্মাণ করিয়াছে, সুন্দর করিয়াছে সিদকাটিতে; দুই প্রেমেরই আনাগোনা রন্ধ্রপথের রহস্যের অন্ধকারে। এই রহস্যই দুই প্রেমের প্রাণ। আবার রহস্যই রোমান্টিক ধর্মের প্রধান লক্ষণ।"[১৬] তাই তার কাব্যে সমস্ত ধর্মীয় আবরণ ভেদ করে মানবিক প্রেমরস তথা রোমান্টিকতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়। সেদিক থেকে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' তথা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যটিতে সমকালীন ধর্মীয় প্রসঙ্গ থাকলেও কাব্যটিকে একটি রোমান্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে গণ্য করতে পাঠকের অসুবিধা হয় না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারায় রামপ্রসাদ সেন একটি অতিপরিচিত ব্যক্তিত্ব। যদিও তাঁর এই বিপুল খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁরই বাস্তবনিষ্ঠ কালী সাধনা বিষয়ক শ্যামাসঙ্গীত। এই শ্যামাসঙ্গীতের হাত ধরেই তিনি যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর রচনার এই কালজয়ী মাধুর্য লক্ষ্য করে সমালোচক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর কাব্যে রোমান্টিক কল্পনার উৎসার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন --- "রামপ্রসাদের কাব্যে স্বতোৎসারণের প্রেরণা বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব জনিত নয়, এই উৎস তাঁর নিজের মধ্যেই নিহিত ছিল। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেখানে বন্দনা আছে বা মাতৃমূর্তি মাতৃ মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে সেখানে তিনি প্রথাবদ্ধ, তত্ত্বকেন্দ্রিক। কিন্তু যেখানে তিনি মায়ের জন্য সন্তানের আকুলতা ও আর্তিকে ভাষা

দিলেন, সেখানে তাঁর কবিতায় রোমান্টিক আবেগময়তার পরিচয় নিহিত।"[১৭] তাই আজও পর্যন্ত বাঙালির রামপ্রসাদ চর্চা যতখানি লক্ষ করা যায়, তা মূলত রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতকে অবলম্বন করেই। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কাছে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা ছাড়া অন্যকোন পরিচয় উঠে আসেনা। কিন্তু এই শ্যামাসঙ্গীত ব্যতীতও তিনি আরো অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য – 'কালীকীর্ত্তন', 'কৃষ্ণকীর্ত্তন', 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি। তন্মধ্যে আমার আলোচ্য বিষয় রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' ।

'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যধারায় রামপ্রসাদই একমাত্র কবি নন। তাঁর পূর্বে ও পরেও অনেকে বিদ্যাসুন্দরকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। এছাড়াও আমরা জানি রামপ্রসাদ একজন বীরাচারী সাধক ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে রামপ্রসাদের মত একজন সাধক কবি বিদ্যাসুন্দরের মত সমাজ-বিরুদ্ধ কাহিনী নি কেন কাব্য রচনা করতে গেলেন? এর উত্তরে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকটিই ছিল অবক্ষয়ের সময়। সেই শতাব্দীর ভাবনা-চিন্তা পূর্ববর্তী ভাবনা-চিন্তা থেকে পৃথক ছিল। যে বিদেশী বিধর্মী শক্তির প্রবলতা খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে আকস্মিকভাবে বাঙালীর জীবনকে পরাভূত করেছিল এবং যার ফলে বাঙালী দেবতার আশ্রয় নিয়ে ধর্মের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজছিল, সেই অবস্থার ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। একদিকে শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রমে বাঙালীর হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়ে চলছিল। বাঙালীর দৃষ্টি আবার বহির্মুখী হবার অবকাশ পাচ্ছিল। অন্যদিকে নগর জীবনে তখন বিলাসিতার স্রোত চলছে, গ্রামের সাধারণ মানুষও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সেই বিলাস বহুল জীবন যাত্রার দিকে। সেই অবক্ষয়ের যুগে স্বভাবতই মানুষের ধর্মবুদ্ধি বা নীতিবুদ্ধির স্থান অধিকার করেছিল দেহাত্মবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে গড়ে উঠে প্রচুর 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। এ বিষয়ে আধুনিক সমালোচক যথার্থই বলেছেন --- "সমাজে ধর্মের হইয়াছিল অধঃপতন, প্রেম পরিণত হইয়াছিল ইন্দ্রিয়বিলাসে। নাগরিক বাঙালীর মনে দেবতা, ধর্ম ও পরলোক-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থার অনিবার্য ফল দেহ বুদ্ধির প্রাবল্য ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসুন্দর কাব্য যতই অশ্লীল হোক না কেন, ইহা বস্তুনিষ্ঠ। ইহা আদর্শ-সর্বস্ব, নির্জীব, শূন্যচারী নহে; ইহা প্রত্যক্ষ, দেহ নিষ্ঠ ও সত্য। এই জন্য ইহাদের মধ্যে জাতি পাইয়াছে মোহ মুক্তির সন্ধান।"[১৮] স্বাভাবিকভাবেই রামপ্রসাদ সেনও মধ্য বয়স পর্যন্ত এই বস্তু নিষ্ঠ বিদ্যাসুন্দরের প্রেমোপাখ্যানেই মজে ছিল। এছাড়াও তিনি যেহেতু একজন বীরাচারী সাধক ছিলেন সেদিক থেকে ব্যাখ্যা করে বলা যায় এই কাব্য বীরাচারী সাধকের মানব জমিন তত্ত্ব-তল্লাসেরও এক অভিনব পন্থা। দেবত্বের স্তরে উন্নীত মানুষ রামপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ভরা সংসারে 'কামকূপের' রস থেকে মানুষ রামপ্রসাদ যে বঞ্চিত ছিল না, জীবিকা ধারণে যে তবিল দারির সাধকও তিনি ছিলেন, 'রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে' তাকে ফাঁকি দিয়ে—রামপ্রসাদ তা জানতেন, তাই তিনিও কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জগতেই তৃপ্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই বাস্তব নিষ্ঠ ধ্যান-ধারণা থেকেই তিনি লিখলেন 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' কাব্য।

রামপ্রসাদের 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাণের স্পর্শ লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতকের কৃত্রিমতার যুগে এ এক ব্যতিক্রম রূপেই প্রতিভাত হয়। কেননা, রামপ্রসাদ লোক সমাজ থেকে তাদের প্রাণের ভাষা, অনুভূ থেকেই তার কাব্য রচনা প্রেরণা লাভ করেছিল। আসলে রামপ্রসাদ তৎকালীন রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবেশ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বিশিষ্ট কোন কাহিনী বর্ণনা করতে চাননি। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। রামপ্রসাদ তার প্রেমোপাখ্যান 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের শুরুতেই সেই স্বতন্ত্রতার পরিচয় রেখেছেন। কবি কাব্যে 'অথ বিদ্যার রূপবর্ণন' অংশে নারীর দেহভঙ্গিমা' শরীরগঠন সম্পর্কিত বর্ণনায় জানিয়েছেন ---

"নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে।।
অমিয় জড়িত ভাষা নাসা তিন ফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল।।
পুষ্পধনুধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা।
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা।
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ।।
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান।

ক্রমে ক্রমে বাড়ির বারণকুম্ভস্থান।।...
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম পারাবার পার সার অবলম্ব।।...
কোন বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে।।
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর।।"[১৯]

অংশটিতে একদিকে পুরুষের কামোদ্রেকের বর্ণনা অন্যদিকে প্রেমের চিরন্তন রূপটি প্রকাশিত হয়েছে। রামপ্রসাদ বিদ্যার রূপ বর্ণনায় উদ্ধৃতাংশটিতে নারী-পুরুষের আদিমতম যাচনাকেই তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই যাচনাবোধ চিরন্তন যাকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারেনা। এভাবেই তিনি তাঁর কাব্যে মানবিক চেতনা তথা রোমান্টিক মনোভাবে নানা বৈশিষ্ট্যগুলিকে অল্প অল্প করে উপস্থাপন করেছেন।

রামপ্রসাদ তার কাব্য 'মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন' অংশে সুন্দরকে দেখে মালিনীর কামোদ্রেক ভাব বর্ণনায় লিখেছেন ---

"ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া।।
কটির কাপড় গাণ্টি* কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে।।
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে।।
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার।।"[২০]

অংশটি অশ্লীল বলে মনে হলেও ব্যক্তি মানসে চিরন্তনতার দাবি রাখে। কবি প্রসঙ্গক্রমে 'নীচজাতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমাদের বক্তব্য উক্ত আচরণ কেবল নীচজাতির মধ্যেই লক্ষণীয় নয়। আসলে একটু গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে আচরণটি সমগ্র মানব জাতির সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই লক্ষণীয়। আবার 'বিদ্যার বাসরসজ্জা' অংশে আরো নিবিড় ও মানবিক স্পন্দনের ইঙ্গিত দিয়েছেন রামপ্রসাদ। কবি জানিয়েছেন ---

"ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা* মনোহরা।
সরভাজা নিখুঁতি বাতাসা রসকরা।।
অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষী রছানা।।
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া।
ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া।।...
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী।।
মল্লিকা মালতীমালা সুবর্ণের পাত্রে।
যুবক যুবতী দেহ দহে ঘ্রাণ মাত্রে।।"[২১]

এখানেও দেখি প্রেমাস্পদ বিদ্যাকে সুন্দরের আবাহনের এক নিবিড় বর্ণনা এবং নির্দিষ্ট কিছু রীতি-নীতি। বাসর সম্পর্কিত সেই বর্ণনায় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী সমেত সজ্জা ও রীতি-নীতির বিস্তৃত বর্ণনা তৎকালীন বাঙালির রোমান্টিক মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। এছাড়াও বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে যুবক যুবতীর দেহ-দহন এবং ঘ্রাণের প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই এই দেহ-দহন এবং দেহ-ঘ্রাণ আজও কি এক রূপ নয়? অশ্লীল সত্ত্বেও তা আমাদের হৃদয়ে চিরন্তনতার প্রতীক হয়ে ধরা দেয় না? আবার রামপ্রসাদ

তার কাব্যে শৃঙ্গার বিশ্লেষণে বিশেষত 'অথ বিপরীত শৃঙ্গার' অংশে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মানবিক রসাবেদনে যুক্তিপূর্ণ। কবি বলেছেন ---

"অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে।
পুরুষের কার্য প্রভু রমণী কি পারে।।
বিদগ্ধ বটে হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।
কেমন এমন কথা মুখ ভরে কও।।
সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল গা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা।।...
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশু বদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ।।
বিদ্যা বলে পায়ে পড়ি সেকি এত মধু।
গণিকা তো নহি প্রভু হই কুলবধু।।"[২২]

রামপ্রসাদের প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন করে বলা যায়, মধ্যযুগীয় ধ্যানে যে দেব-দেবী ছিল ক্রুর ও নিষ্ঠুর, ছলনাকুশল, যারা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুষের পূজা আদায় করত, রামপ্রসাদের ধ্যানে সেই দেব-দেবীরা হলেন কল্যাণময়, ভাবময়, প্রেমময়, স্নেহময় ভালোবাসার বস্তু। যে মানুষ মধ্যযুগে ছিল প্রকৃতি ও সংসারের হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পর্যুদস্ত, সেই মানুষই রামপ্রসাদের কল্পনায় হল বলিষ্ঠ ও আত্ম-প্রত্যয়বান। যে মানুষ সংসার সংগ্রামে দিশে হারা হয়ে অদৃষ্ট বা নিষ্ঠুর দেবতার কবলে নিজেকে সমর্পণ করত, সেই মানুষ এখন হৃদয়ে গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে আত্মশক্তিতে শক্তিমান হয়ে জননীর কোলে এসে আশ্রয় নিল রামপ্রসাদের হাত ধরে। এই যে মানুষকে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্য য়ফিরিয়ে দেওয়া, আবেগময় প্রেম ও ভক্তির ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ করা, অষ্টাদশ শতকের ভাবাদর্শে এ এক বিস্ময়কর রূপান্তর, আজ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তা ধারণায় আনা কঠিন ব্যাপার। এই পরিস্থিতে বসবাস করে রামপ্রসাদের মানুষের প্রতি যে অপরিমেয় বিশ্বাস ও ভালোবাসা, মানবিক মূল্যেরচেতনা, সমাজবোধের চেতনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তাই রামপ্রসাদের রচনার বিশেষত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের সর্বপ্রধান সম্পদ।

সবশেষে বলা যায়, ভারতচন্দ্রের বা রামপ্রসাদের আগেও কেউ কেউ 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' বিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে ষোড়শ শতকে কবি দ্বিজ শ্রীধর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেব মহিমা অনুপস্থিত। কবি শাহ বারিদ খাঁ (মতান্তরে সাবিরিদ খাঁ) সৃষ্ট বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও দেবী মাহাত্ম্য তেমনভাবে স্থান পায়নি। সপ্তদশ শতকে কবি কঙ্ক (সময়কাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে) বিরচিত আর একটি বিদ্যাসুন্দর কাহিনির কথা শোনা যায়। সমালোচকদের মতে তার কাব্যেও দৈবী প্রভাব তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়া, কবি গোবিন্দদাস তাঁর কালিকামঙ্গল কাব্যে সর্ব প্রথম বিদ্যাসুন্দরের অংশ সংযুক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। তার পূর্বে যে কয়েকজন রচয়িতা বিদ্যাসুন্দরের আখ্যানভাগ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন তারা কেউই বিদ্যাসুন্দরের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যে দেবী কালিকার মাহাত্ম্যকে তেমনভাবে জুড়ে দেননি। সকলেই স্বতন্ত্রভাবে হয়তো একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাই তাদের রচনায় দৈবী মাহাত্ম্য অপেক্ষা নর-নারীর বিশুদ্ধ প্রেমই অধিক প্রশ্রয় পেয়েছিল। তবে সময়পোযোগী ধর্মীয় চেতনার ছিটেফোঁটা প্রভাব তাদের রচনায় পড়েনি তেমন নয়। তবে কাব্যগুলির শিল্পসৌন্দর্য ব্যক্তির পরিণত মনকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়। তাই কবিরা রোমান্সের গল্পকেও শিল্পকলার গুনে জীবনচেতনা, মানবিকবোধ দ্বারা সর্বজন আস্বাদ্য রস সমৃদ্ধ করে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলা যায়। এছাড়াও এই ধারায় বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন কৃষ্ণরাম দাস, বলরাম চক্রবর্তী, প্রাণরাম চক্রবর্তী। ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ ছিলেন বস্তুত এঁদেরই উত্তরসূরি। তাই তাদের রচনায় দৈবী মাহাত্ম্য এবং নারী-পুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম উভয়ই সমানভাবে স্থান পেয়েছে। তাসত্ত্বেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই উপলব্ধি করা যায়, তারা তাদের কাব্যে সময়োপযোগী দৈবী প্রভাবকে প্রাধান্য দিলেও নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণকে উপস্থাপন করতেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। বিশেষত ভারতচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ পাঠে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এমনকি রামপ্রসাদও এর ব্যতিক্রমী নন। যদিও রামপ্রসাদের কাব্যে দৈবীমাহাত্ম্য ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অধিক, তাসত্ত্বেও বলতে হবে বেশ কিছু অংশে অশ্লীলতার প্রসঙ্গকে অবলম্বন করে নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণকে উপস্থাপন করতে, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। সেদিক থেকে দুজন কবির কাব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ

করলে তাদের কাব্যের রোমান্টিক প্রেমকাহিনীটিই পাঠককে অধিক আকৃষ্ট করে। বলা যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান সাহিত্যধারায় তাদের ‘কালিকামঙ্গল’ তথা ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য দুটির সংযোজন এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্যসূত্র

১) সুকুমার সেন – ‘চর্যাগীতি পদাবলী’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পঞ্চম মুদ্রণ – ডিসেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা - ৬২

২) ড. আবদুস সাত্তার – ‘বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যান’, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় প্রকাশ – জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা - ১

৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ০২

৪) ওয়াকিল আহমদ – ‘বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান’, কে.এম.ফিরোজ খান, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ৯ বাংলা বাজার, দশম মুদ্রণ - জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা - ১২-১৩

৫) সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) – ‘কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ২০১১, পৃষ্ঠা : ভূমিকা, ক-২৬

৬) আশুতোষ ভট্টাচার্য – ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা; লি;, ২বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ; সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৬৫৯

৭) প্রমথ চৌধুরী – ‘বীরবলের হালখাতা’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথমপ্রকাশ – ১৩২৪, পৃষ্ঠা - ৫৭

৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) – ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ-ভাদ্র ১৩৫০, পুনর্মুদ্রণ-আশ্বিন ১৪২১, পৃষ্ঠা - ২৫৯

৯) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৭৫-২৭৬

১০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৪১-২৪২

১১) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৩৭

১২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২৪২

১৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ২২৯-২৩০

১৪) শঙ্করীপ্রসাদ বসু – ‘কবি ভারতচন্দ্র’, দে'জ পাবলিশিং, ১৩বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ-জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা-২১৬

১৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস(সম্পাদিত) – ‘ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ-ভাদ্র ১৩৫০, পুনর্মুদ্রণ-আশ্বিন ১৪২১, পৃষ্ঠা-২১৫

১৬) প্রমথনাথ বিশী – ‘বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য’, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা-১২, চতুর্থ সংস্করণ-কার্তিক ১৩৬৭, পৃষ্ঠা- ৬৩-৬৪

১৭) শশিভূষণ দাশগুপ্ত – ‘ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তিসাহিত্য’, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ- বৈশাখ ১৩৯২, পৃ-২৭

১৮) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য – ‘সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়’ (আদি ও মধ্যযুগ), জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃষ্ঠা- ৩৪৯

১৯) বাঁধন সেনগুপ্ত – ‘রামপ্রসাদ ও তাঁর সমগ্র রচনাবলী’, এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাই. লিমি., ১৪বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ- মাঘ১৪২১, পৃষ্ঠা-১৩৭

২০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৩৯

২১) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৪৯

২২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৫৫

সহায়ক গ্রন্থ

১) শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য – 'ভারতচন্দ্র ও রাপ্রসাদ', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৭

২) দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য – 'কবিরঞ্জন রাপ্রসাদ সেন', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ - চৈত্র১৪০৫

৩) দীনেশচন্দ্র সেন (অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত) – 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, তৃতীয় মুদ্রণ - আগস্ট২০০২

৪) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয়খণ্ড : প্রথমপর্ব)', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬-২০০৭

৫) আশুতোশ ভট্টাচার্য – 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০০৯

৬) বিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত – 'বিদ্যাসুন্দর' সটীক ও সচিত্র এবং জীবন চরিত সমালোচনা সম্বলিত, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেশিন প্রেসে, কলুটোলা স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১২৯৩

সহায়ক পত্রিকা

১) 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা সংখ্যা, শারদ ২০১৬

২) 'ঐকিক' সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, মনসামঙ্গল সংখ্যা, প্রথমবর্ষ ২০১৫